চুকনগরের গণহত্যা

হাসান নীল

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর এদেশের বুকে স্বাধীনতা এসেছিল এক রক্তের সাগর পেরিয়ে। চুকনগর গণহত্যা এর বড় একটি অধ্যায়। চুকনগরে আজও নাম না জানা শহীদের স্বজনেরা ঘুরে বেড়ায়। বোবা কান্নায় ভারী হয়ে যায় অনুভূতি, স্বজনহারাদের আর্তনাদে গুমোট বাঁধে আকাশ।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতের আঁধারে দেশের বুকে নেমে পড়েছিল পাকিস্তানি স্বাপদ। যাদের হিংস্র থাবা ও বারুদের আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গিয়েছিল দেশ। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে দুটি পথ বেছে নিয়েছিল এ ভূখণ্ডের মানুষ। পালিয়ে বাঁচা নয় বুক চিতিয়ে লড়াই ও প্রতিরোধ গড়ে তোলা। ততদিনে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র খুলে দিয়েছে সীমান্ত। আক্রান্ত মাটির লাখ লাখ মানুষ প্রাণের তাগিদে সকল সহায় সম্বল ফেলে শরণার্থী বেশে আশ্রয় নেয় পশ্চিমবঙ্গে। পাশাপাশি দেশমাতৃকাকে রক্ষার পণ করেছিলেন যে দামাল ছেলেরা, রণাঙ্গনে নিজেকে তৈরি করতে, শত্রুর বুকে থাবা বসাতে তারাও ভারতে চলে যায়। উদ্দেশ্য, যুদ্ধের ট্রেনিং নেওয়া। এই দুই লক্ষ্য সামনে রেখে অনেক মানুষ জড়ো হয়েছিল চুকনগরে।

খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার ছোট্ট একটি গ্রাম চুকনগর। এটি অবস্থিত ভদ্রা নদীর তীরে। চুকনগর ও তার পশের অঞ্চল ১৯৭১ সালে ছিল হিন্দু অধ্যুষিত। এখানে বলে রাখা ভালো সেসময় পাক বাহিনীর আক্রমণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল হিন্দুরা। তবে যে মুসলমানদের উপর অত্যাচার কম হয়েছে তা কিন্তু নয়। তবে যে গ্রামে হিন্দুদের সংখ্যা বেশি ছিল সেসব গ্রামের উপর আক্রোশ বেশি ছিল। শুধু ধর্মীয় রোষের কারণে চুকনগর ও তার আশেপাশের এলাকার অধিবাসীদের ভাগ্যে নেমে এসেছিল চরম দুর্দশা। এই নারকীয় কাজে পাকিস্তানিদের সহায়তা করে যুদ্ধাপরাধী আল বদর, আল শামস। চুক নগর ও তার আশেপাশের বাসিন্দাদের জীবন সেসময় বিপন্ন ছিল। নিরাপদ জীবনের আশায় প্রাণের চেয়ে প্রিয় স্বদেশ ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন তারা। আর এজন্যই তারা জড়ো হয়েছিলেন চুকনগরে। চুকনগর ছিল একাধারে যশোর, খুলনা, সাতক্ষীরা জেলার সংযোগ স্থল।

ভদ্রা, কাজীবাছা, খড়িয়া, ঘ্যাংরাইল থেকে নদীপথে এবং কাঁচা রাস্তায় দাকোপ, বটিয়াঘাটা, রামপাল, তেরখাদা ও ফকিরহাট উপজেলা থেকে খুলনা-ডুমুরিয়া হয়ে সেসময় সীমান্ত পাড়ি দেওয়ার সবচেয়ে নিরাপদ রুট ছিল চুকনগর। তাছাড়া মাটির রাস্তা ও নদীর কারণে প্রায় বিচ্ছিন্ন এই রাস্তা। ফলে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আনাগোনা সেখানে ছিল না বললেই চলে। ভদ্রা নদী দিয়ে চারদিক ঘেরা চুকনগরে তিন জেলা থেকে নদীপথে আসা যেত খুব সহজে। চুকনগরের সঙ্গে তিন জেলার জলজ সংযোগ ছিল ভদ্রা। নদী পার হতে পারলেই কিছুদূর পর সীমান্ত। আর সীমান্ত মানেই তখন নিরাপদ জীবন।

দিনটি ছিল ১৯ মে। সেদিন আশেপাশের অঞ্চল থেকে মানুষ এসে জড়ো হতে থাকে চুকনগর বাজারে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে মানুষের সংখ্যা। ধীরে ধীরে চুকনগর বাজার হয়ে ওঠে জনারণ্য। পরে তা রূপ নেয় জনসমুদ্রে। এভাবের কেটে যায় একদিন। এদিকে বিপন্ন মানুষের এই জড়ো হওয়ার কথা জানতে পারেন আটালিয়া ইউনিয়ন চেয়ারম্যান গোলাম হোসেন। শান্তি বাহিনীর সদস্য ছিলেন তিনি ও ভদ্রা নদীর খেয়া ঘাটের ইজারাদার শামসুদ্দিন খাঁ নামের এক বিহারী। তারা খবরটি সেদিনই চুপিচুপি গিয়ে দিয়ে আসে সাতক্ষীরায় অবস্থিত হায়নাদের ক্যাম্পে। জানান, চুকনগরে হিন্দুদের ঢল নেমেছে। অর্ধ লক্ষেরও বেশি মানুষ চুকনগরের পাতখোলা বিল, চুকনগরের কাঁচাবাজার, মাছ বাজার, কাপুড়িয়া পট্টি, গরুহাটা, বাজারের কালী মন্দির, বটতোলাসহ বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান নিয়েছিল। কেউ পলিথিনের তাঁবু টানিয়ে জিরিয়ে নিচ্ছিল। শেষবারের মতো দেখে নিচ্ছিল প্রিয় স্বদেশ। আবার কেউ বাজার সদাই সেরে নিচ্ছিল, কেউ খাচ্ছিল, কেউ কেউ উদাস হয়ে ভাবছিল অনিশ্চিত ভবিষ্যতের। সবার একটাই অপেক্ষা। আজকের দিনটা পার করে পরদিন সকালে রওনা করবে ভারতের উদ্দেশে।

তাদের চোখ তখন সীমান্তে। ওখানে জীবন দাঁড়িয়ে আছে নিশ্চয়তা নিয়ে। সেখানে যেতে পাড়ি দিতে হবে বেশ খানিক পথ। সেদিন জড়ো হয়েছিল দুটি দল। এক দলে ছিল এ ভূখণ্ডে সহায় সম্বল ফেলে রেখে শুধুমাত্র জীবনের নিরাপত্তার কথা ভেবে এক হওয়া মানুষ। অন্য দলে ছিল দেশের বুকে হামলে পড়া হায়নাদের বিষ দাঁত ভেঙে দেওয়ার দৃঢ়প্রত্যয় নিয়ে জড়ো হওয়া অজস্র ক্ষুদিরাম। যারা ওপারে যাবে অস্ত্র প্রশিক্ষণ নিতে, যোদ্ধারূপে নিজেদের তৈরি করতে। এরপর নিয়ে ফিরে এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে রণাঙ্গনে।

কিন্তু কেউ কি জানত নদীর পাড়ে দাঁড়ানো ওই মানুষগুলোর সঙ্গে সীমান্তের দূরত্ব ছিল মৃত্যু সমান! সেদিন নিরাপদ জীবনের উদ্দেশ্যে ভারতে পাড়ি দিতে তারা যখন অপেক্ষমান তাদের মৃত্যু পরোয়ানা নিয়ে জিপ ও ট্রাকে করে রওনা দিয়েছে পাকিস্তাননি মিলিটারিরা। সঙ্গে ছিল এদেশের দোসর বাহিনি। চুকনগর- সাতক্ষীরা সড়ক ধরে তারা প্রথমে মালতিয়া মোড়ের ঝাউতলায় অবস্থান নেয়। তখন রাস্তার পাশে পাট ক্ষেতে কাজ করছিলেন মালতিয়া গ্রামের চিকন আলী মোড়ল নামে একজন। পাকবাহিনী দেখেই উঠে দাঁড়ান তিনি। অমনি ঘাতকের বুলেট ছুটে যায় চিকন আলীর বুক বরাবর। বীর চিকন আলী হায়নাদের উদ্দেশে হাতের কাস্তে ছুড়ে মেরেছিলেন। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ। শত্রুর গুলি এফোঁড়ওফোঁড় করে দিয়েছে চুকনগর গণহত্যার প্রথম শহীদ চিকন আলীকে।

এরপর শুরু হয় নির্মম হত্যাযজ্ঞ। নিরস্ত্র মানুষগুলোকে লাইনে দাঁড় করিয়ে গণহত্যা শুরু করে হায়নারা। তারা দুই ভাগ হয়ে এক দল পাতখোলা বিল থেকে চাঁদনী, ফুটবল মাঠ, চুকনগর স্কুল, মালতিয়া, রায়পাড়া, দাসপাড়া, তাঁতিপাড়া, ভদ্রা ও ঘ্যাংরাইল নদীর পাড়ে জমা হওয়া মানুষদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে থাকে। মুহূর্তেই চুকনগর হয়ে পড়ে লাশের নগরী। সেদিন

গা শিউরে ওঠা এই হত্যাকাণ্ডে ভদ্রা রক্তে লাল হয়ে যায়। লাশের স্তূপে থেমে গিয়েছিল নদীর গতিপথ। অস্ফুট আর্তনাদ, মৃত্যু যন্ত্রণায় ভারী হয়েছিল চারদিক। স্তনে মুখ রাখা শিশুর ঠোঁট লাল হয়ে গিয়েছিল গুলিবিদ্ধ মায়ের রক্তে। তবুও এক মুহূর্তের জন্য বিরতি নেয়নি হায়েনার মেশিনগান। অবশেষে বেলা চারটার দিকে গোলাবারুদ ফুরিয়ে গেলে হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করে তারা।

সেদিন নারকীয় হত্যাযজ্ঞের শিকার মানুষের সংখ্যাটা ঠিক কত ছিল? তার নির্দিষ্ট সংখ্যা পাওয়া সম্ভব হয়নি। তবে ধারণা করা হয়, বারো হাজার কিংবা তারও অধিক মানুষ মারা পড়েছিল সেদিন। সংখ্যাটি যে অমূলক নয় তা লাশ ফেলার বর্ণনা থেকেই স্পষ্ট। স্থানীয়রা সেদিন হাত লাগিয়েছিল লাশ ফেলায়। প্রথম দিকে পাকসেনাদের পছন্দসই স্থানে লাশ স্থানান্তর করা হলেও সংখ্যার আধিক্যের কারণে হাল ছেড়ে দেয় তারা। এরপর হাত লাগায় স্থানীয়রা। ভদ্রার জলে ভাসিয়ে দিতে থাকে লাশ। সেদিন লাশ ফেলার কাজে নিয়োজিত চুকনগরের কৃষক গণহত্যার প্রত্যক্ষদর্শী আফসার আলী সরকার বলেছিলেন, 'সকালবেলা একখানা মিলিটারি গাড়ি আসল। আমাদের বললো লাশ ফেলার জন্য। এক হিন্দু বাড়ি থেকে বাঁশ নিলাম। বাঁশ নিয়ে বেশ খাটো খাটো করে এপাশ বেঁধে দুই জনে মিলে আমরা ৯-১০টার দিকে নদীতে লাশ ফেলতে শুরু করলাম। আমার সাথে ছিল আমার বেয়াই ইনসার আলী। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত লাশ ফেললাম। প্রথমে গুনেছি তারপর গুনিনি। অগণিত লাশ ফেললাম। রাতে বাড়ি এসে গোসল করে শুয়ে পড়লাম। সারাদিনে কম করে হলেও আমরা ৫ থেকে ৬ হাজার লাশ ফেলেছি।' সেদিন দীর্ঘ চার মাইল ব্যাপী এ হত্যাকাণ্ডে শ্মশান হয়ে পড়েছিল চুকনগর। নদীতে লাশ ফেলা শেষ হয়েছিল ২১ মে বিকেল চারটায়। ফলে ভদ্রা নদী হয়ে উঠেছিল লাশের ভাগাড়। কিন্তু এত লাশ ধারন করতে পারেনি নদী। ফলে মানুষ পচা গন্ধে আচ্ছন্ন হয়ে যায় অঞ্চলটি। এ অবস্থা এড়াতে অনেক পচাগলা লাশ পরে মাটিচাপা দেওয়া হয়।

এর প্রভাব এতটাই ছিল যে দীর্ঘ ২ মাস ওই নদীর মাছ খায়নি স্থানীয়রা। আর ভয়ে ৫-৬ মাস চুকনগর আসেনি কেউ। এ হত্যাযজ্ঞের খবর পেয়ে অনেকেই ছুটে এসেছিল স্বজনের খোঁজে। কেউ পেয়েছিল লাশ। আর যারা পায়নি তারা ভেবেছিল হয়তো স্বজনেরা নিরাপদে পৌঁছেছে সীমান্তের ওপার। যুদ্ধ শেষে ঠিকই ফিরবে ভেবে তারা আশায় বুক বেঁধেছিলেন। কিন্তু তাদের কেউ ফেরেনি।

এদিকে স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দী কেটে গেলেও চুকনগর বধ্যভূমি পায়নি তার যথাযথ মূল্যায়ন। অসমাপ্ত রয়েছে এখানকার স্মৃতিস্তম্ভের কাজ। এ নিয়ে স্থানীয় বীর মুক্তিযোদ্ধারা দীর্ঘদিন দাবি জানিয়ে এলেও ফলপ্রসূ হয়নি তা। ফলে আজও অবহেলিতই রয়ে গেছে বধ্যভূমিটি।